কে এই পাশা

ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী স্বনামধন্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও সুলেখক মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবার কলম তুলে নিয়েছেন উদ্ভাসের জন্য। শুনিয়েছেন তাঁর ছবি সংগ্রহের কাহিনী, এক অজানা ছবির পরিচয় উদ্ধারের কাহিনিও।

সংগ্রহ করার প্রবণতা আমাদের এক অতি আদিম প্রবৃত্তি। অতিদূর অতীতে হান্টার গেদারার রাই তো ছিলেন আধুনিক আমাদের পূর্বপুরুষ। সাগর-সৈকতে যে শিশুরা সংগ্রহ করে শামুকের খোল, পাহাড়ের কোলে তারাই সংগ্রহ করে নুড়ি-পাথর আর ছোট্ট মেয়েটি ফুলের বাগান থেকে কোঁচড় ভর্তি করে শিউলি ফুলে।

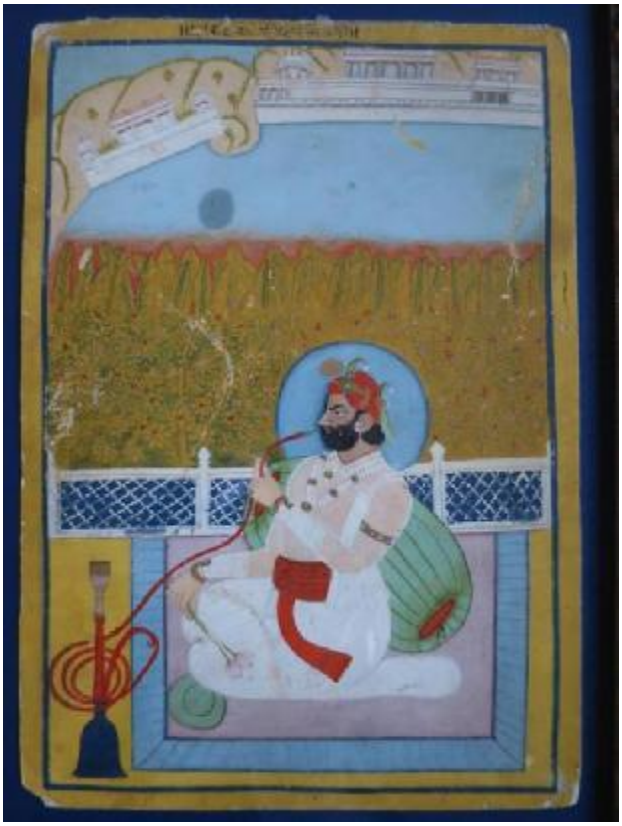

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রবণতা, রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে নানা লোকে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন নানা কারণে। কাচের গুলি থেকে দ্য ভিঞ্চির শিল্পকর্ম, হেন জিনিস নেই যা সংগ্রাহকদের আগ্রহের বাইরে। আমার আগ্রহ প্রাচীন ভারতবর্ষকে নিয়ে। ভারতীয় মুদ্রা, বই, ফোটোগ্রাফ, কিংবা ভাস্কর্য আর অবশ্যই ভারতীয় চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রী সংগ্রহে আমার উৎসাহ। শিল্পবস্তুর সৌন্দর্য আমায় যেমন আকর্ষণ করে তেমনি সেই বস্তুটি সংগ্রহের ইতিহাসও আমায় সমানভাবেই আকর্ষণ করে। সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে যেসব গল্প, সেগুলি আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে গল্পের মধ্যে যে অভাবিত ঘটনা থাকে, যে ঘটনার মোচড় থাকে, যে অজানাকে জানবার হাতছানি থাকে, তাই আমার কল্পনাকে উস্কে দেয়, আমায় উৎসাহিত করে আরও খুঁজতে, আরও জানতে।

জানিনা সংগ্রাহকদের জন্য আলাদা কোনো বিধাতা আছেন কিনা, কিন্তু যদি থাকেন, তবে তাঁর আশীর্বাদ যে আমি পেয়েছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কতবার যে কত

আশ্চর্যভাবে কাঙ্খিত বস্তু সামগ্রী আমার জীবনে যেন আপনি এসেছে তা আমাকেই অবাক করে দেয়।

এইরকম একটি আশ্চর্য যোগাযোগের গল্প বলা যাক আজ।

বেশ কয়েক বছর আগে ক্রিসমাসের ছুটির অবকাশে আমরা সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম নিউ মেক্সিকো রাজ্যের রাজধানী সান্তা ফে বলে একটি শহরে। এই শহরটি খুবই সুন্দর এবং অনেক আর্ট গ্যালারি ও বহু বিখ্যাত শিল্পীদের বাস আছে বলে শহরটি বিখ্যাত।

প্রথম দিন ভালই কাটল। নানা গ্যালারি দেখা গেল। ছবির পর ছবি। মনমুগ্ধকর। কিন্তু তার পরদিন থেকেই শুরু হলো তুষারপাত। কিছু বেলায় বেরিয়ে দেখি অনেক দোকানপাটই বন্ধ। অজানা শহর, খুব বেশি সম্ভব নয় তুষারের মধ্যে, ঠান্ডার মধ্যে হাঁটা, তবু বেশ খানিকটা ঘোরাঘুরির পর চোখে পড়লো একটি দোকানের বন্ধ দরজা। দরজার ওপর লেখা 'আমরা এখানে ছবি, প্রিন্ট ইত্যাদি বিক্রি করি'। সাইনবোর্ডে একটি টেলিফোন নাম্বার দেওয়া ছিল, আমি সেটি নিয়ে হাজার মাইল দূরে আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। তারপর কয়েকদিন বাদে ফোন করলাম দোকানের নম্বরে। দোকানের মালিক ফোন ধরলে জিগ্যেস করলাম, তাদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় কোন ছবি, প্রিন্ট, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি কিছু আছে কিনা? ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'না, ইন্ডিয়ান কিছু নেই, তবে একটা ছবি আছে, ''পাশা স্মোকিং হুকা''।

প্রথমটা আমি একটু নিরাশ হলাম, কারণ ভাবলাম হয়তো এটি তুরস্ক কিংবা ইজিপ্ট বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের ছবি। ভারতীয় বোধহয় নয়। ছবিটা দেখতে তবু ইচ্ছে হলো। আমার ভেতরের কেউ যেন বলল, আরে আর একটু দেখনা। বললাম, ছবিটা পাঠানো সম্ভব? পছন্দ হলে নিতে পারি। এদেশে এখনও লোকে পরস্পরকে বিশ্বাস করে। উনি বললেন, বেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। যেমন কথা তেমনি কাজ। কদিন বাদেই ছবিটি হাতে এলো।

ছবিটি দেখেই বুঝে গেলাম এটি অন্য কোনো দেশের নয়, ভারতবর্ষের ছবি। খুব সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি পরিণত বয়স্ক যুবা পুরুষ বাম দিকে তাকিয়ে বড় একটি তাকিয়াতে হেলান দিয়ে আসনের ওপর বসে সামনে রাখা গড়গড়ি থেকে দীর্ঘ পাইপ মুখে দিয়ে ধুমপান করছেন। স্বাস্থ্যবান পুরুষ, গায়ের রং ভারতীয়দের মতোই শ্যামলা। মাথায় লাল রঙের পাগড়ি, তাতে অলংকার, মুখে চাপ কালো দাড়ি। কানে দুটি হিরের দুল, দেহে অন্যান্য অলংকারও শোভা পাচ্ছে। দু'হাতে জড়োয়ার মনিবন্ধ। গলায় মুক্তার মালা, মালায় মাঝে মাঝে দামি রঙিন পাথর। উর্ধাঙ্গে সুতির জামা, নিম্নেও সুতির বাস। ধুতি বলেই মনে হয়। পা মুড়ে বসেছেন। ডান হাতে ধরা আছে দুটি পদ্মফুল। বাম পায়ের তলায় ছোট একটি বালিশ। মাথার পেছনে নীল রঙের বলয়। রাজাদের ছবিতে যেমন দেখা যায়। সাদা রঙের অধঃবাসের ওপর লাল ও সোনালী রঙের কোমরবন্ধ, যা আবার পাগড়ির রঙের সঙ্গে মানিয়েছে। সবুজ তাকিয়ার প্রান্তেও একই রকমের রঙের

ব্যবহার ছবিটিতে একটি সুন্দর সুষমা দিয়েছে। ছবিটির পেছনে জাফরি কাটা রেলিং, তারপরে একটি ফুলের বাগান। বাগানটির বামদিকের অংশে গাছের পাতা ও ফুলগুলি সম্পূর্ণ, অর্থাৎ পাতার রং সবুজ ও ফুলের মাঝে লাল রং বোঝা যায়। ডানদিকের অংশে ফুল ও পাতার স্কেচ ও ফুলের মাঝের লাল রং দেখা যায়, কিন্তু পাতার সবুজ রং করা হয়নি। ফুলের বাগানের গাছের বেড়া, অনেকটা কলাপাতার মত পরপর সাজানো। তারপর একটি হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি ধূসর বৃত্ত। (চাঁদের ছায়া?) হ্রদের ওপরের দিকে দুটি প্রাসাদ। প্রাসাদ দুটি দেখে মনে হয় এ দুটি যেন বিলাস প্যাভিলিয়ন। মূল প্যাভিলিয়নটির অবস্থিতি হ্রদের সঙ্গে সমান্তরাল, কিন্তু বাম দিকেরটি একটি কৌণিক রেখায় যা সাধারণত দেখা যায় না। প্যাভিলিয়নগুলি সুন্দর করে আঁকা। একেবারে হ্রদের ওপর। দেখে মনে হয় স্কেচ সম্পূর্ণ হলেও, রং করা শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়নি। প্যাভিলিয়নগুলি যেন দুটি জমির ওপর যেখানে বাগান আঁকার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু বোধহয় তাও সম্পূর্ণ করা হয়নি। ছবিটি ২৬ × ১৯ সেন্টিমিটার। মোটা দাগের হলুদ বর্ডারের মধ্যে সরু দাগের নীল বর্ডার।

এখন প্রশ্ন হলো ছবিটি কার? ছবিটি কোন রাজার বা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর বলে মনে হতে পারে। রাজার হওয়া স্বাভাবিক। রাজা হলে হিন্দু, না মুসলমান না শিখ? লক্ষ্যণীয় যে পুরুষটির কোমরবন্ধে কোনো তরোয়াল নেই। তাই শিখ বলে মনে হয়না। পাগড়ির ধরণ দেখেও শিখ মনে হয়না। মুসলমান পুরুষের মত পোষাক ও ভঙ্গি নয়। কোনো মুসলমান নৃপতির হাতে পদ্মফুল দেখেছি বলে মনে করতে পারিনা। তাহলে এটি নিশ্চয় কোনো হিন্দু নৃপতির। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তো বহু হিন্দু রাজারা ছোটো বড়ো মাঝারি নানা রাজ্যে তখন রাজস্ব করছেন, কিন্তু ঠিক এই রাজাটি কে?

উত্তর ছবিটির মধ্যেই আছে, শুধু দেখবার অপেক্ষা। ছবিটির একদম ওপরে হলুদ বর্ডারের মধ্যে হিন্দিতে লেখা অস্পষ্ট হলেও পড়া যায় শ্রী মহারাজ জী ...। বোঝা গেল এটি নিঃসন্দেহে কোনো হিন্দু রাজার ছবি, কিন্তু পুরো লেখটি যেহেতু আমি পড়তে পারছি না, তাই ঠিক মন ভরছে না। এখন উপায়?

এইখানে একটি কথা জানানো দরকার যে পুরনো কোনো ছবি বা যে কোনো বস্তু পেলে সেটি উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখা দরকার সেখানে কোনো লেখ আছে কিনা? অনেক সময় শিল্পী তাঁর স্বাক্ষর লিখে যান ছবিতে বা ভাস্কর্যে যা হয়ত চট করে পড়া যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া যায়। ছবির পেছনটা তাই দেখা খুব দরকার।

আর সেখানেই এই গল্পের এক চমৎকার উদঘাটন। দেখি পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখা রয়েছে H. H. Maharaja Mokum Singh of Kishengarh. এই লেখা পড়ে আমার হৃদস্পন্দন দ্বিগুণ হলো একটি অতি দুর্লভ ভারতীয় মিনিয়েচর আমার হাতে, যার পরিচিতি নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ছবিটি অর্ধ-সমাপ্ত বলে বিরলতম বলে গণ্য হবে। তাছাড়া মোকাম সিং খুব পরিচিত নাম নয়, তাই এই ছবির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

কিষেনগড় রাজ দরবারে সব রাজাদের ছবি আছে বলে পড়েছি কিন্তু সেরকম কোনো ছবি আমার চোখে পড়েনি।

রাজস্থানের একটি ছোট রাজ্য কিষেণগড়। যোধপুরের রাজা উদয় সিংহের ছেলে কিষেন সিংহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। মনে করা হয় রাজ্য পত্তনের প্রায় একশ বছর পরে এখানে ছবি আঁকা ও সংগ্রহ করা শুরু করা হয়। মহারাজ রাজ সিংহের ছেলে মহারাজ সাভান্ত সিংহের সময় থেকেই এই কিষেনগড় চিত্রকলার বিশিষ্ট শৈলীর সূচনাকাল। কৃষ্ণভক্ত রাজা সাভান্ত নাগরী দাস এই নামে বহু কবিতা রচনা করেছিলেন এবং নিজে উঁচুদরের চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর ছবি যা দেখা যায় তা সত্যি প্রথমসারির। কবি, চিত্রী, প্রেমিক ও পরম বৈষ্ণব এই নৃপতির জীবনে বাণী খানি বলে এক নারীর প্রেমকাহিনি জড়িত আছে। বাণী খানিকে দিল্লীর ক্রীতদাসীদের হাট থেকে কিনে নিয়ে আসেন রাজার মা। রাজ-অন্তঃপুরের দাসী একদিন নিজ গুণে মন জয় করে নেন মহারাজের। তারপর এই সুন্দরীকে মডেল করে চিত্রশিল্পীরা মহারাজের অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি করেন তথাকথিত কিষেণগড় শৈলী।

বহুদিন বাক্সবন্দি হয়ে থাকার পর কিষেণগড় রাজদরবারে রক্ষিত এই অমূল্য ও বিশাল চিত্রসংগ্রহ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরিক ডিকিনসন সাহেবের নজরে আসে ১৯৪৩ সালে। জহরি যেমন রত্ন চেনে তেমনি ডিকিনসন সাহেব অনেক ছবির মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু রত্ন উদ্ধার করেন এবং হ্যাঁ, ভালো করে ছবি দেখতে দেখতে ছবিগুলির পেছনে তিনি হিন্দিতে লেখা কিছু পদ আবিষ্কার করেন, যার পর থেকে উদ্ভাসিত হতে থাকে কিষেণগড় রাজ পরিবারের বল্লভাচার্যর প্রতি ভক্তি, রাধাকৃষ্ণ, গোপালের প্রতি প্রেম ইত্যাদি নানা অজানা তথ্য। আলোচ্য ছবিটি অবশ্য সাবান্ত সিংহের অনেক পরের ছবি। ব্রজবাসী সাবান্ত সিংহ মারা যান ১৭৬৪ সালে। আর মোকাম সিংহ সিংহাসনে আসীন হন ১৮৩৮ সালে। ১৮৪১ অবধি তাঁকে সিংহাসনে দেখি। ততদিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আরও অনেক ছোটো বড়ো রাজ্যের মতো ব্রিটিশের এক সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে কিষেণগড়। মহারাজ হয়েছেন হিজ হাইনেস। পেয়েছেন ১৫ তোপের সম্মান।

কিষেণগড় চিত্রের শৈলী পাল্টিয়েছে। মহারাজ মোকাম সিংহের এই আলোচ্য ছবিটি বাস্তবানুগ কিন্তু কিষেণগড় শৈলীতে নয়। আমার হাতে না এলে এবং পরিচিতি উদ্ধার না হলে ছবিটি এই সুদুর আমেরিকায় অপরিচিতই থেকে যেত। মহারাজ মোকাম সিংহ 'পাশা স্মোকিং হুক্কা' এই বলেই কারো বাড়িতে অজানা, অচেনা, নামহীন হয়ে শোভা পেতেন মাত্র।